

তো তো চা ন

জানালার ধারে ছোট্ট মেয়েটি

মূল

তেৎসুকো কুরোয়ানাগি

অনুবাদ

চৈতী রহমান



প্রকাশন

অনুবাদকের উৎসর্গপত্র

পথের পাঁচালীর সেই ছোট্ট শিশু অপুকে ।

যার ঘরে প্রায়ই পরদিন সকালে খাওয়ার মতো কিছু থাকত না । ঘরের চালা ফুটোফাটা হয়ে বৃষ্টির জল পড়ত । দারিদ্র্য-দুঃখকষ্ট ছিল নিত্য ঘটনা । এরমধ্যে জন্মে সে দেখতে পেয়েছিল আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, চারপাশ থেকে শুষ্ক নিতে শিখেছিল আনন্দ । ছোট ছোট ঘটনায় সুখি হওয়া শিখেছিল সে, অহেতুক হা-হতাশে নিজের জীবন অপচয় করেনি । মুগ্ধ পর্যটক হয়ে সে যাপন করেছিল নিজের জীবনটা; যে জীবনে দুঃখ, শোক, আনন্দ, বেদনা, ভালোবাসা সকল অনুভূতি পাশাপাশি বাস করে । এবং হাতে তুলে নিয়েছিল বই । শিক্ষা তার জীবন থেকে দূর করেছিল সব অন্ধকার ।

মুখপাত

‘মানবসভ্যতার মহত্তম আবিষ্কারের নাম ভালোবাসা।’

—দ্বিজেন শর্মা

আমাদের অতি পরিচিত একজন শিশু অপু। বাড়ি তার নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে। পৌষ মাসের এক সকালে অপু লেপ মুড়ি দিয়ে রোদ উঠবার অপেক্ষা করতে করতে মায়ের মুখে পাঠশালার নাম শুনল। মা বলছেন আজ তার পাঠশালায় যেতে হবে। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! অপূর ধারণা ছিল যে যারা দুষ্ট ছেলে, মায়ের কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, শুধু তাদেরই পাঠশালায় পাঠানো হয়ে থাকে। সে তো কক্ষনো এরকম করে না, তবে তার কেন পাঠশালায় যেতে হবে?

অপূর যাওয়ার কথা ছিল গ্রামের প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায়। যেখানে মুদি দোকান চালাতে চালাতে, খদ্দেরকে তেল নুন মেপে দিতে দিতে রাগী রাগী গলায় তিনি ছেলেদের পড়ান। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমশাইয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তারা বলতেন, ছেলেদের যাতে পা খোঁড়া আর চোখ কানা না হয়, এটুকু খেয়াল রেখে গুরুমশাই যত ইচ্ছা বেত চালাতে পারেন। গুরুমশাই তার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করবার চেষ্টায় এমন বেরোয়া বেত চালাতে থাকেন যে তার ছাত্ররা পা খোঁড়া ও চোখ কানা হবার দুর্ঘটনা থেকে কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যায় মাত্র।

অপু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের চরিত্র হলেও আমাদের সবার খুব কাছের একজন জানাশোনা মানুষ সে, তার জীবনের বহু গল্প আমরা জানি। অপু বই পড়তে খুঁটব ভালোবাসত। নিজের বাড়িতে পড়ে থাকা পুরনো পুঁথি থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ধার করা বই, পত্রপত্রিকা, বাবার হিসেবপত্র, বিজ্ঞাপনের কাগজ...যা পেত সামনে তাই-ই পড়ে ফেলত সে। বইপত্র পড়ে নিত্যনতুন সব কাজের কি অকাজের কতকিছু জানা যেত! যেমন ধরা যাক, শকুনির ডিমে পারদ পুরে মুখের ভেতরে রাখলে আকাশে ওড়া যায়...এই অসাধারণ জ্ঞানটি সে লাভ করেছিল অতি আত্মহে নিজে নিজে পুরনো বাক্সপ্যাটরা ঘেঁটে জরাজীর্ণ পুরনো বুরবুরে বইপত্র পড়ে ফেলার অভ্যাস থাকায়। তবে কিনা ওভাবে আকাশে ওড়া গেলে তো কেউ আর হেঁটেচলে এদিক ওদিক যেত না, উড়েই যেত বটে!... যে শিশুর এতখানি পড়ার আকাঙ্ক্ষা, মায়ের মুখে পাঠশালায় পড়তে যাবার কথা শুনেই সে ভয় পেয়ে গেল।

আমাদের আরেক পরিচিত শিশু রবি। সে বাস করত মস্ত শহর কলকাতায়। ভাইবোনেরা তার চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিল তাই সে তাদের কাউকে খেলার সাথী হিসেবে পায়নি। বাবা ঘুরে বেড়াতেন বাড়ি থেকে দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে, মা ছিলেন দুরারোগ্য অসুখে শয্যাশায়ী তাই মায়ের কাছে যাওয়াও বারণ ছিল শিশুটির। মস্ত বাড়িতে অনেক অনেক লোকজনের ভিড়ে কতক একা একাই সে বড়ো হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে বেঁধে দেওয়া জীবন ছিল তার। রবি ছিল মোটের ওপর খুবই চুপচাপ শান্ত স্বভাবের ভাবুক এক শিশু, কাউকে সে বিশেষ জ্বালাতন করত না। কিন্তু কেন জানি সে খুবই জ্বালাতন শুরু করত মাস্টার মশাই পড়াতে এলে! মোটেই মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়া করতে চাইত না সে। মাস্টারকে নিয়মিত ফাঁকি দেবার একেবারে পোক্ত দুটি উপায় ছিল তার—মাথাব্যথা করছে আর পেট কামড়াচ্ছে। দুটোই বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। সে কিন্তু কক্ষনো বলত না যে জ্বর এসেছে, কারণ সে ঠিক জানত জ্বর এসেছে বললে যদি গা-গরম না করে তাহলে অজুহাতটি ধোপে টিকবে না। সে যুগে ইশকুলের মাস্টারদের বিশ্বাস ছিল পিটুনি না দিলে ছাত্রদের মগজে কিচ্ছু ঢুকবে না। পিটুনির ভয়েই সে এইসব নানা বাহানা নিয়ে অসুস্থ মায়ের কাছে গিয়ে লুকোত। পেট

কামড়ানো ব্যারামের গল্প বানানো ছোট শিশুটিকে কাছে পেয়ে মা খুব খানিক হেসে ভৃত্যদের বলে দিতেন, যাও মাস্টার মশাইকে গিয়ে বলো ও আজ পড়বে না।

ছোট রবি পড়ালেখা অপছন্দ করত তা কিন্তু মোটেই ভাবা চলবে না! বই পড়া, গান শেখা কোনোটাতেই তার আপত্তি ছিল না। সে নিজে নিজে অনেক পড়ালেখা করত, এত পড়ালেখা অন্য অনেকেই সে যুগে করত না। একেবারে শিশু বয়স থেকেই পদ্য লিখত সে, সংগীত শিখত মন লাগিয়ে। কিন্তু তার সকল আপত্তি ছিল মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়া করতে, আপত্তি ছিল ইশকুলে যেতে। বহুবার ইশকুল বদলানো হয়েছে, কিন্তু রবির কোনো ইশকুলেই বেশিদিন পড়া হয়নি। তারপর তার কখনও বিশ্ববিদ্যালয় কি কলেজও পড়া হয়নি। রবির বন্ধুরা একেকজন দেশে বিদেশে বহু নামডাকওয়ালা জায়গায় গিয়ে পড়ালেখা করে এসেছে। কিন্তু সে পড়ালেখা করেছে স্বাধীনভাবে, একা একা। আর...কি মজার ব্যাপার-স্যাপার...যে রবি ইশকুল মোটে পছন্দই করত না সে কিনা বড়ো হয়ে নিজেই একটা ইশকুল খোলে! সেই ইশকুল কালে কালে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।... আর হ্যাঁ, বড়ো হয়ে রবির নাম হয় রবীন্দ্রনাথ। সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে যায়। কারণ তিনি তাঁর লেখায় এমন কিছু শুনিয়েছিলেন বিশ্বকে যা অন্য কেউ কখনো শোনায়নি।

আমরা জানি যে শিশু জন্মায় কোনো না কোনো পরিবারে, পরিবারের বড়োরা তাকে ভাষা শেখায়। অন্য পরিচিত বড়োদের সঙ্গে মিশতে মিশতে, ছোটোদের সঙ্গে খেলতে খেলতে নানা আচার-আচরণ শেখে শিশু। তারপর তার যেতে হয় ইশকুলে। ইশকুলে সে খেলাধুলা করে বন্ধুদের সঙ্গে, লিখতে পড়তে শুরু করে, শেখে মাথা খাটাতে। ইশকুল হলো শিশুর দ্বিতীয় বাড়ি। কিন্তু অপু ও রবি, আমাদের পরিচিত এই দুই শিশুই ইশকুলে যেতে ভয় পেয়েছিল। খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এই দুই শিশুই পড়তে ভালোবাসত, খেলতে ভালোবাসত, নতুন কিছু শিখতে ভালোবাসত, অজানাকে জানতে ভালোবাসত। তাদের দুজনেরই মন ছিল খোলা, দুজনেরই ছিল জীবনমুখী। কিন্তু ইশকুল ছিল

তাদের জন্য নিরানন্দ বিভীষিকাময় কিছু একটা। এটাই আমাদের চিন্তার বিষয়। নিশ্চয়ই প্রচলিত 'ইশকুল' ধারণাটায় এমন কোনো বিষয় আছে যা এই দুইটি শিশু মেনে নিতে পারেনি।

নিশ্চিন্দিপুরের ছোট বাড়িতে বড়ো হওয়া অপু যেমন শিশু, কলকাতার মস্ত গমগমে বাড়িতে বড়ো হওয়া রবি ঠিক তেমনই শিশু। ইংল্যান্ডের শিশু এলিস কিংবা লুসি, সোভিয়েত দেশের শিশু আলিওনুশকা কিংবা সেরিওজা, সুইডেনের শিশু পিপি লংস্টকিং, জাপানের শিশু তোত্তোচান...আমাদের পরিচিত এই শিশুদের বাড়ি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে, তাদের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা। কিন্তু তাদের মন, তাদের চিন্তাভাবনা একইরকম। শিশুর পরিচয় কিন্তু শ্রেফ শিশুই, তা সে যে দেশেই জন্মাক। শিশু কথাটার আগে বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গভেদ, জাতিপরিচয়, সামাজিক শ্রেণি কিছু বসবার কথা নয়। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষাজীবন হবার কথা আনন্দময় ও ভয়ভীতিহীন। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে দেশভেদে শিশুর ইশকুল-ভাগ্য ভিন্নরকম। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার শিশুরা জন্মের পরপরই পাচ্ছে মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা, হাসিখুশি আনন্দ উৎসব আর নিরাপত্তা। সেই একই পৃথিবীতে আফ্রিকার শিশুরা শত শত বছরের ঔপনিবেশিকতার নানারকম শোষণ, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের মাঝে সমর্পিত এক জীবনে জন্ম নিয়ে ইশকুল কাকে বলে তা চিনতে শুরু করেছে সদ্য। মধ্যপ্রাচ্যের শিশুরা জন্মাচ্ছে যুদ্ধের মধ্যে, যুদ্ধ দেখে বাপ-মা হারানো শিশুরা মানবিকতা থেকে দূরে সরে গিয়ে ক্রমশ ধর্মান্ধতা আর ঘৃণার শিক্ষা নিয়ে বড়ো হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার শিশুরা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিরানন্দ সব ইশকুলে যাচ্ছে কেবলমাত্র এইজন্য যে শিক্ষা তাদের একটা চাকরি জুটিয়ে দেবে।... দৃষ্ট বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা 'কীরকম' এবং 'কীরকম তা হবার কথা ছিল'—এর মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য ব্যাপক।

বাংলাদেশের শিশুরা ঠিকঠাক শৈশব পায় না। দারিদ্র্য, ধর্মান্ধতার শিকলে বাঁধা আড়ষ্ট বুদ্ধির বদ্ধ সমাজে খেলাধুলা আনন্দ উৎসব করে সুন্দর এক মানবিক শিক্ষাব্যবস্থায় চোখের আলো পাবার জায়গা শিশুকে

আমাদের রাষ্ট্র করে দিতে পারেনি। সুন্দর শৈশব এখানে চড়া দামে কিনতে চাইলেও পাওয়া যায় না। এর মধ্যে বসবাস করেও যারা শৈশবে সোভিয়েত দেশ থেকে আসা বলমলে রঙিন রূপকথাময় বইপত্র পড়তে পেরেছিল নিজেদের মাতৃভাষাতেই, তাদের মস্তিষ্কে পাকাপাকিভাবে বসে গেছে এক আনন্দময় নরম অনুভূতি। নিঃসন্দেহে এই অনুভূতি দেশের এমনকি পৃথিবীর সকল শিশুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারলে খুব ভালো হত। আমাদের শৈশবে মস্কো থেকে ইংরেজি ভাষার একটা পত্রিকা আসত ‘মিশা’ নামে। পড়তে না পারলেও তার মনকাড়া ছবিগুলো দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে যেত আমাদের। মিশার পাতায় পাতায় সোভিয়েত দেশের শিশুদের সুন্দর সব ইশকুলের ছবি, ইশকুলের ছেলেমেয়েদের হাতে আঁকা রঙিন ছবি, তাদের নাচের ক্লাশের ছবি, কেউ বাঘ সেজেছে, কেউ ভালুক সেজেছে...তার ছবি। ইশকুল তো নয় যেন রূপকথা! সোভিয়েত দেশ যে অন্য দেশ তা তো অত ছোটো বয়সে আমি বুঝতাম না, তবে বুঝতাম যে ইশকুল খুবই আনন্দময় একটা জায়গা। রাস্তায় একরকম কাপড় পরা ইশকুল-যাউন্টি সব ছেলেমেয়েদের দেখে তাই ভাবতাম তারা নিশ্চয়ই মিশা পত্রিকার ছেলেমেয়েদের মতো নানারকম মজার কাজ করতে ইশকুলে যাচ্ছে। আমার মোটেই তর সইত না তখন, শুধুই ভাবতাম কবে আমার ইশকুল শুরু হবে! কবে আমি ওদের মতো চুলে ফিতে দিয়ে, শাদা জুতো মোজা পরে ইশকুলে যেতে পারব! বাড়ির লোকেরা আমার আগ্রহ দেখে বলত, এই তো তুমি ইশকুলে যাবে...আরেকটু সবুর কর, আরেকটু বড়ো হও, নিজে নিজে আরেকটু পড়তে শেখো! কিন্তু আমি তক্ষুনি তক্ষুনি ইশকুলে যাবার জন্য ছটফট করতাম!... তারপর আমি একদিন সত্যি সত্যি ইশকুলে ভর্তি হই।

আমার প্রথম ইশকুল ছিল খুব সুন্দর। সেখানে বড় বড় কয়েকটা খেলার মাঠ, শহীদ মিনার, বাগান, এমনকি কয়েকটা দোলনাও ছিল। ইশকুলে যাওয়ার সময় আমাকে আলাদা কাপড় পরানো হত, মাথায় চুল ছিল খুবই কম তবুও সাদা ফিতে দিয়ে সেই চুলে কোনোরকমে ফুল করে দেওয়া হত—সকালবেলার এসব আয়োজন ছিল আমার খুবই পছন্দের। সকালে ইশকুল মাঠে একটা গান গাওয়া হত সবাইকে

লাইনে দাঁড় করিয়ে। গানের কথাগুলো সোজা, সব আমি শুনতে পেতাম ঠিকঠাক, কিন্তু কথাগুলোর অর্থ বুঝতাম না। যেমন ‘অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি, আমি কী দেখেছি মধুর হাসি’—এই কথাটা খুব সোজা, কিন্তু ক্ষেতে কী দেখেছে তা ঠিকঠাক বুঝতাম না, পরে বাড়ি গিয়ে বড়োদের জিজ্ঞেস করে অর্থ বের করার চেষ্টা করতাম! গান গাওয়ার পর আমাদের ক্লাশঘরে নিয়ে বসিয়ে দিত বড় ক্লাশের দিদিরা। তারপর একের পর এক শিক্ষক আসতেন এবং ব্ল্যাকবোর্ডে খসখস করে কী সব লিখতেন। সেসব লেখা অক্ষর মোটেই আমার বাড়ির ছবির বইগুলোর মতো নয়, অন্যরকম করে লেখা হিজিবিজি লাইন সব, যা আমি পড়তে পারতাম না। পড়ালেখা যা হত তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকত না। আমি খুঁজে মরতাম কোথায় ছবি আঁকার সরঞ্জাম? কোথায় নাচ হচ্ছে? কোথায় বাঘ ভালুক সেজেছে বন্ধুরা? কোথায় রূপকথার মতো সাজানো ক্লাশঘর?... আমার কল্পনার ইশকুল আর বাস্তবের ইশকুলের মধ্যে কোনো মিলই ছিল না। আমি ইশকুলে গিয়েছিলাম খেলতে, ছবি আঁকতে আর নাচতে—যেমনটা দেখেছিলাম সোভিয়েত পত্রিকার পাতায়। অথচ আমার ইশকুলের কোথাও আমি সেসব খুঁজে পেলাম না। ইশকুল ছিল আমার ওইটুকু জীবনে সবচেয়ে বড় স্বপ্নভঙ্গ যার প্রভাব পড়েছে আমার পরবর্তী জীবনে। অবশ্য এ ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি বড়ো হবার পরে।

মায়ের কর্মস্থল বদলানোর কারণে বেশ কয়েকবার ইশকুল বদলাতে হয়েছে আমাকে। একমাত্র প্রথম ইশকুলেই পেয়েছিলাম প্রশস্ত খেলার মাঠ, এছাড়া আমার পরের প্রতিটি ইশকুলই ছিল মনখারাপ করা পাখির খাঁচার মতন বন্ধ। ঢাকার ‘কিন্ডারগার্টেন’ নামের ইশকুলগুলোকে দেখে আমি চিনতেই পারতাম না ইশকুল বলে। শ্রেফ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দমবন্ধ চারতলা বাড়ি আবার ইশকুল হয় নাকি? বাড়িতে আমার সঙ্গে জোরে কথা বলা হত না, মারা হত না, কিন্তু ইশকুলে গিয়ে শুনেছিলাম এখানে দুষ্টমি করলে খুব মারা হয়। ভয়ে আমার ইশকুল থেকে তখন পালিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করত খুব। শিক্ষকরা কেন জানি ঠিকমতো কথাই বলতেন না আমাদের সঙ্গে, হাসতেন না মোটেই। কেন জানি খুব রাগী চোখে তাকাতেন তারা! মনে হত আমি সর্বক্ষণই

কোনো অপরাধ করছি যার জন্য তারা আমাকে ঘৃণা করছেন।...
কক্ষনো আমি ইশকুল ভালোবাসতে পারিনি। কেবল যেতে হয় বলে
নিয়ম রক্ষার্থে মন ভার করে ইশকুলে গেছি নিয়মিত।

কিন্তু ইশকুল কি কেবল নিয়ম রক্ষার্থে মুখ শক্ত করে ভয়ে ভয়ে
যাবার জায়গা? ইশকুল কি শিশুদের জন্য নানা নিয়মের শিকলে বাঁধা
কোনো বদ্ধ জেলখানা? এই বইয়ে তার উত্তর খোঁজা যেতে পারে। এই
বইটি তোত্তোচান নামের একজন শিশুর ইশকুল নিয়ে লেখা। এটি এমন
এক ইশকুল যেখানে যেতে পেরে শিশুদের মন আনন্দে ভরে উঠত।
শিশুরা ঘুম থেকে উঠেই এক দৌড়ে ইশকুলের দিকে ছুটত। ইশকুল
কামাই দেবার কথা তারা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারত না।... কেমন ছিল
তোত্তোচানের ইশকুল? তা তোত্তোচানই আমাদের বলবে।

আমাদের বাড়িতে আজন্ম একটা সোভিয়েত বই দেখে এসেছি,
'ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে'। বইটি ছিল আমার বাবার আলমারিতে,
তিনি তা পড়ে পড়ে পেন্সিল দিয়ে দাগও দিয়ে রেখেছিলেন। বইয়ের
নাম দেখে আমার মনে প্রশ্ন আসত, ছেলেমেয়ে তো মানুষের ঘরেই
জন্মায়, তাকে আবার মানুষ করা...এ আবার কি রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার-
স্যাপার রে বাবা! কালে কালে বড়ো হতে হতে (কিংবা বলা যায় বড়ো
হওয়া শিখতে শিখতে) আমি এর উত্তর অল্প অল্প জানতে পারি।

পাখিরা বাসা বানায়, ডিম পাড়ে, ছানা ফোটায়, তারপর সেই
ছানারা কোথাও উড়ে যায় ডানা মেলে। ব্যাঙ ডিম দেয়, ব্যাঙাচি
ফোটায়, তারা লেজ নেড়ে নেড়ে সাঁতার দেয় ডোবার অগভীর জলে,
একসময় সেই ব্যাঙাচিদের লেজ খসে পড়ে, তারপর তারা ব্যাঙ হয়ে
থপথপিয়ে বেড়ায়। হাতিশাবক জন্মায় দীর্ঘ বাইশ মাস মায়ের পেটে
গুটিসুটি মেরে থাকার পর, জন্মেই সে টলমল করে নিজের পায়ে ভর
দিয়ে দাঁড়ায়, তারপরে শুঁড় নেড়ে নেড়ে মায়ের পায়ে পায়ে চলতে শুরু
করে। বড় হয়ে হাতিশাবক তার পরিবারের সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়, দায়িত্ব
নেয় দলের।... পাখির ছানা কিভাবে পাখি হবে, ব্যাঙাচি কিভাবে ব্যাঙ
হবে, হাতিশাবক কিভাবে হাতি হবে তা নিয়ে এদের বাপ-মায়ের
আপাদা করে ভাববার দরকার হয় বলে তো মনে হয় না! মানুষের তবে

এই কথা ভাববার দরকার হলো কেন যে নিজের ছেলেমেয়েকে ‘মানুষ’ করা খুব জরুরি? শিশুরা কি মানুষশাবক হয়েই জন্মাচ্ছে না?

মানবসভ্যতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে এর উত্তর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের নানা তত্ত্ব আছে মানুষের ‘মানুষ’ হয়ে ওঠা নিয়ে। তার মধ্যে একটা হলো সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া ‘সামাজিকীকরণ’ তত্ত্ব। মানুষ বাস করার জন্য সমাজ তৈরি করেছে। তাই যখন একজন শিশুর জন্ম হয় সে যেমন পরিবারের সদস্য হিসেবে জন্ম নেয়, তেমনি সে সমাজের সদস্য হিসেবেও জন্ম নেয়। জন্মানো মাত্র সে পরিবার ও সমাজ থেকে (মানে তার চারপাশের বড়োদের কাছ থেকে) ভাষা, আচার-আচরণ শিখতে শুরু করে—যাকে বলে সংস্কৃতি। পরিবারই শিশুকে সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আর তারপর শিশু সমাজের সদস্য হয়ে ওঠে চারপাশের নানা মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে—এই প্রক্রিয়াই হলো ‘সামাজিকীকরণ’। আমরা দেখি জাপানি সমাজে জন্ম নেওয়া শিশু জাপানিদের মতো আচরণ করে, বাঙালি সমাজে জন্ম নেওয়া শিশু বাঙালিদের মতো আচরণ করে। সামাজিকীকরণ তত্ত্ব অনুসারে, জাপানি কোনো শিশুকে যদি বাংলাদেশে বড়ো করা হয় কোনো বাঙালি পরিবারের সদস্য হিসেবে তবে সে কখনোই জাপানিদের মতো আচরণ করবে না, সে বাঙালির মতো আচরণ করবে, বাঙালিদের মতোই খাদ্যাভ্যাস হবে তার, সে বাংলা ভাষায় কথা বলবে। কারণ সে তার চারপাশের বড়োদের কাছ থেকে বাঙালি সমাজের আচার-আচরণ-ভাষাই শিখবে। তাই অতি সাধারণ এক অর্থে শিশুকে ‘মানুষ করা’ বলতে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ সমাজে বসবাসকারী মানুষ হিসেবে যোগ্য করে তোলার কথা বোঝানো হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা শুধু সমাজ নিয়ে চিন্তা করেই শেষ কথা বলতে রাজি নন। তাদের কাছে মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্সের) ‘মানুষ’ হয়ে ওঠা নিয়ে আরও নানা তত্ত্ব আছে।

বাপ-মা, পরিবার, ইশকুল, বন্ধু, আত্মীয়দের কাছ থেকে সমাজের রীতিনীতি নিয়মকানুন জেনে তাতে পরিপাটি হয়ে বসবাস করা শিখলেই কিন্তু ঠিক যাকে বলে ‘মানুষ’ তা হওয়া যায় না। মানুষ যেমন পরিবারের সদস্য, নিজ দেশের গণ্ডির মধ্যকার সমাজের সদস্য, তেমনি সে পৃথিবীর

একক মানবসমাজের সদস্য, আবার সে এই গ্রহের প্রাণিকুলেরও একজন সদস্য। আমাদের মনে রাখা উচিত যে মানুষ নেহায়েতই একটি প্রাণী, তবে সে অন্যদের তুলনায় একটু বুদ্ধিমান বলেই অন্য প্রাণীদের চেয়ে আধুনিক একরকম ‘সভ্য’ সমাজ সে তৈরি করতে পেরেছে। এই মানবসমাজ কোনো স্থায়ী বিষয় নয়, এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এতে বসবাস করতে থাকা মানুষের হাতেই। মানুষ হাজার বছর আগে অন্য পশুপাখিদের মতো বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হতে মানবসমাজ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং আজও তা পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। তাই জন্মের পর সমাজের রীতিনীতি শিখে নিলেই মানুষের কাজ মোটেই ফুরোচ্ছে না। বর্তমানে মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান-বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজের মানবিক পরিবর্তন ঘটানো। এক্ষেত্রে খুব সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দেওয়া যায়; প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের সমাজ এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে যা পূর্ববর্তী শতকগুলোতে হয়নি। এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মানবিক চিন্তাভাবনার উন্নয়নের ফলে।

মানবসমাজ এতই জটিল যে এখানে মানবশিশুকে ঠিক পাখির ছানা, ব্যাঙাচি কিংবা হাতিশাবকের মতো সরলভাবে ‘মানুষ’ করা যায় না। স্পষ্টত অন্য প্রাণীর শাবকেরা একটি কাজ মানুষশাবকের মতো করে করে না। তা হলো মস্তিষ্কের নিত্যনতুন ব্যবহার বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বুদ্ধিমত্তার চর্চা। মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে জানার জন্য মানুষশাবকের দরকার হয় শিক্ষা। তাই খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তার মতোই শিক্ষা বর্তমান মানবসমাজে বসবাসকারী মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষের চোখে সেই আলো দেয় যা দিয়ে মানব মস্তিষ্কে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করা যায়। মানুষকে এখন আর অন্য প্রাণীদের মতো কেবলমাত্র পাকস্থলীকেন্দ্রিক জীব হিসেবে ভাবা হয় না। মানুষ যতখানি পাকস্থলীকেন্দ্রিক জীব, বলা যায় প্রায় ততখানিই মস্তিষ্কনির্ভর জীব। বর্তমান মানবসমাজ কেবলমাত্র জন্ম থেকে মৃত্যু-অঙ্গি বসবাসের স্থান নয়, এটি মানুষের বুদ্ধিমত্তা চর্চা করার স্থানও বটে। পরিবারের পর দ্বিতীয় বাড়ি হিসেবে ইশকুল শিশুকে ‘মানুষ করার’ দায়িত্ব নেয়।

অভিধান

জানানার ধারে ছোট্ট মেয়েটি

রেল ইস্টিশন	৩৩
জানালার ধারে তোত্তোচান	৩৬
নতুন ইশকুল	৪১
আহ্! দারুণ ইশকুল!	৪৩
প্রধানশিক্ষক	৪৫
টিফিনের ঘণ্টা	৫০
তোত্তোচানের ইশকুল শুরু	৫২
রেলগাড়ি ক্লাশঘর	৫৫
ইশকুলের পড়ালেখা	৫৭
সমুদ্রেরে কিছু আর পাহাড় থেকে কিছু	৬১
ভালো করে চিবিয়ে খাও	৬৫
হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি	৬৭
বিদ্যালয়-সংগীত	৭১
ফের জায়গা মতন রাখ	৭৪
তোত্তোচানের নাম কী?	৭৮
রেডিওতে হাস্যকৌতুক	৭৯
নতুন রেলগাড়ি আসবে	৮১
সাঁতারের পুকুর মজার দুপুর	৮৬
রিপোর্ট কার্ড	৮৯
গ্রীষ্মের ছুটি	৯০
বিরিট অ্যাডভেঞ্চার	৯৩
কে কত সাহসী?	৯৮
রিহার্সাল-হল	১০১
উষ্ণ প্রস্রবণে ভ্রমণ	১০৪
ইউরিদমিক্স	১০৯
এইটাই আমার চাই! চাই! চাই!	১১৫
ওদের সবচেয়ে খারাপ পোশাক	১১৯
তাকাহাশি	১২২
দেখেশুনে লাফ মারো	১২৫

আর...তারপর?	১২৭
আমরা শুধু খেলছিলাম তো!	১৩১
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	১৩৪
কবি কোবাইয়াশি ইসসা	১৪০
বড়ই রহস্যময় ঘটনা	১৪৩
হাত দিয়ে কথা বলা	১৪৬
মারুইয়ামা মশাই ও সাতচল্লিশ জন রনিন	১৪৮
মাসো...চা...ন	১৫১
শখের বেণী দুটো	১৫৪
‘থ্যাংক ইউ’	১৫৭
পাঠাগার কামরা	১৬০
লেজ	১৬৪
তোমোয়ে ইশকুলে দ্বিতীয় বছর	১৬৮
রাজহংসের হৃদ	১৭১
মাঠের শিক্ষক	১৭৪
মাঠের রান্নাঘর	১৭৮
তুমি সত্যি সত্যি ভালো মেয়ে	১৮২
বউ	১৮৫
ভাঙাচোরা ঝুরঝুরে ইশকুল	১৮৭
চুলের ফিতে	১৯০
আহতদের দেখতে যাওয়া	১৯৩
স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাকল	১৯৭
ইংরেজি বলা ছেলে	২০৩
নাটক	২০৭
চক	২১০
ইয়াসুয়াকিচান মারা গিয়েছে	২১২
গুপ্তচর	২১৫
বাবার বেহালা	২১৮
কথা দাও!	২২১
রকি কোথায় যেন চলে গেল!	২২৪
টি-পার্টি	২২৮
সাইয়োনারা, সাইয়োনারা! বিদায়, বিদায়!	২৩২
পরিশিষ্ট	২৩৫

তোত্তোচান একটু সরে দাঁড়িয়ে খুশি মনে চেকারের দিকে তাকাল।
লোকটি বেশ মোটা আর চশমা পরা, মোটের ওপর দয়ালুই মনে হয়।

‘হুম!’ কোমরে হাত রেখে তোত্তোচান চেকারের কথাটা নিয়ে ভাবল,
তারপর বলল, ‘বেশ ভালো কথা। আপনার ছেলের সঙ্গে কাজ করার
বিষয়টি নিয়ে আমি ভেবে দেখব! কিন্তু এখন আমি খুবই ব্যস্ত! নতুন
ইশকুলে যাচ্ছি তো!’

বলেই সে দৌড়ে গেল অপেক্ষারত মায়ের কাছে। যেতে যেতেই
চিৎকার করে ঘোষণা করল, ‘আমি বড়ো হয়ে টিকেট বিক্রি করব!’

মা অবাক না হয়েই বললেন, ‘তবে যে সেদিন বললি তুই গোয়েন্দা
না গুপ্তচর কী জানি হতে চাস! তার কী হবে?’

মায়ের হাত ধরে গুটিগুটি এগুতে থাকা তোত্তোচানের মনে পড়ল
মাত্র গতকাল অর্দি এক্কেবারে ঠিক করেই ফেলেছিল যে সে বড়ো হয়ে
গুপ্তচরই হবে! কিন্তু বাস্তবতা রেলগাড়ির টিকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা
যে ঢের বেশিরকম মজার ব্যাপার-স্যাপার! নয়?

‘আচ্ছা!’ তোত্তোচানের মাথায় এমন সময় এল চমৎকার এক বুদ্ধি!
মায়ের দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠল সে খুশিতে! ‘এমন যদি হয় যে
আমি হলাম এক গুপ্তচর, যে কিনা টিকেটও বিক্রি করে! তবে?’

মা কোনো উত্তর দিলেন না। ছোট ছোট ফুল বসানো ফেল্টের হ্যাটে
ঘেরা তার সুন্দর মুখটি কী জানি এক চিন্তায় গম্ভীর। যদি নতুন ইশকুলে
তোত্তোচানকে ভর্তি নিতে না চায়! তোত্তোচান লাফিয়ে লাফিয়ে পথ
চলছে আর আপনমনে বকবক করছে, সে মায়ের মনের অবস্থা জানত
না। তাই যখন মা তার দিকে তাকালেন সে সোলাসে বলে উঠল,
‘আমি গুপ্তচর বা টিকেট চেকার কোনোটাই হব না! আমি রাস্তায়
বাজনা বাজিয়ে গান গাইব আর দোকানে দোকানে বিজ্ঞাপন করব,
চিনদোনইয়াদের মতন!’

১. এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের গল্প। সে যুগে টেলিভিশন ছিল না জাপানে।
তাই এখন যেভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার হয় সেভাবে বিজ্ঞাপন করা সম্ভব ছিল না।
তখনকার রেওয়াজ ছিল বাদ্য-বাজনা সহকারে পণ্যের বিজ্ঞাপন নিয়ে পাড়ায়
পাড়ায় ঘুরবে একদল লোক। তাদের ডাকা হত চিনদোনইয়া বলে।



রেল ইস্টিশান

নামল তারা রেলগাড়ির কামরা থেকে। মা আর তোত্তোচান। ইস্টিশানের নাম জিয়ুগাউকা। ওইমাচি লাইনের ট্রেনে চেপে তারা এদূর এসেছে। তোত্তোচানের হাতটি ধরে মা টিকেট দেখানোর দরোজার দিকে এগুলেন। দরোজায় দাঁড়ানো চেকারকে টিকেট দিয়ে দিতে হয়। এই প্রথমবার ট্রেনে চেপেছে তোত্তোচান, টিকেটটি তার কাছে বড্ড মূল্যবান। চেকারকে টিকেট একেবারে দিয়ে দেবার ব্যাপারটি তার কাছে বেদনাদায়ক। তাই সে শক্ত মুঠোয় টিকেট চেপে রেখে চেকারকে অনিচ্ছুক গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘আমি কি এটা রেখে দিতে পারি?’

‘না!’ বলেই চেকার তোত্তোচানের হাত থেকে মহার্ঘ টিকেটটি নিয়ে নির্লিপ্তভাবে সেটা ফেলে দিলেন টিকেটে-ভরা একটা বাক্সে। দশাসই একবাক্স ভর্তি লোভনীয় টিকেট! তোত্তোচান বাক্সটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চেকারকে ফের জিজ্ঞেস করল, ‘এই সবগুলো টিকেট আপনার বুঝি?’

‘নাহ্! এগুলো রেল ইস্টিশানের জন্য রাখা। একটাও আমার নয়।’ বলতে বলতে ব্যস্ত চেকার অন্য লোকেদের বাড়িয়ে ধরা টিকেটগুলো অবলীলায় কেড়ে নিয়ে বাক্সটিতে ফেলতে থাকলেন।

‘ওহ্!’ বাক্সটিকে দুঃখভরে দেখতে দেখতে তোত্তোচান বলল, ‘যখন বড়ো হব, আমি নিজেই হব একজন টিকেট চেকার!’

টিকেট চেকার এইবার তোত্তোচানের দিকে ভালো করে তাকালেন। তারপর বললেন, ‘বেশ! আমার ছেলেও টিকেট চেকার হতে চায়, তুমি তার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারবে।’

মা বাঁঝের সঙ্গে তোত্তোচানকে বললেন, 'চল্ দেখি! দেরি হয়ে যাচ্ছে! ইশকুলের প্রধানশিক্ষক মশাই অপেক্ষা করছেন। ওনাকে তো আর সারাদিন বসিয়ে রাখা যায় না! বাজে না বকে ঠিকঠাক হাঁটতো দেখি!'

একটু দূরে ইশকুলের ফটকমতন কিছু একটা যেন দেখা গেল। তারা হেঁটে হেঁটে যতটা এগিয়ে যাচ্ছিল, ফটকও যেন তাদের দিকে ততটাই এগিয়ে আসছিল।



জানালার ধারে তোত্তোচান

আসলে তোত্তোচানের মায়ের মনের টিপটিপানি আর একরাশ দুশ্চিন্তার কারণ হলো অল্প কয়দিন হয় তোত্তোচানকে ইশকুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রথম শ্রেণিতে থাকতেই সে বহিষ্কার হয়েছে!

গত হপ্তার কথা, মাকে ইশকুলে ডেকে পাঠিয়েছিল তোত্তোচানের শিক্ষিকা। সোজাসুজি বলেছিলেন, 'আপনার কন্যাটি ক্লাশরুমের সবকিছুতে বিরক্ত করে। সত্যিই ওর সঙ্গে আমি আর পেরে উঠছি না। দয়া করে ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য ইশকুলে ভর্তি করুন।'

মা অত্যন্ত অবাক হলেন! ছোট্ট তোত্তোচান কী এমন করতে পারে যাতে ক্লাশরুমের সবাই বিরক্ত হয়!

মায়ের প্রশ্নাকুল চোখের সামনে বসে তোত্তোচানের কমবয়সী শিক্ষিকা চোখের পাতা বারবার ফেলতে ফেলতে, ছোট করে ছাঁটা চুলে অত্যন্ত বিচলিত ভঙ্গিতে হাত বুলাতে বুলাতে ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। গলায় তার রাজ্যের হতাশা।

'কী দিয়ে যে শুরু করি!... যেমন ধরুন, সে ক্লাশের পড়া চলাকালীন সময় একশোবারের মতন তার ডেস্ক খোলে আর বন্ধ করে। সত্যি সত্যিই একশোবার! আমি তাকে বলি প্রয়োজন না হলে যেন সে ডেস্ক বারবার না খোলে। তখন আপনার মেয়ে খাতা, পেনসিল, রবার, বই সবকিছু ডেস্কের ভেতর রেখে একটা একটা করে বের করতে থাকে।... আমি যখন 'অ' অক্ষরটি লিখতে বলি তখন আপনার মেয়ে ঢাকনা খুলে খাতা বের করে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে ঢাকনা বন্ধ করে।

শিক্ষিকা শ্বাস ছেড়ে ফোঁস করে বলেন, 'ক্লাশঘরের জানালার ধারে'
হতবুদ্ধি মা ফের বলেন, 'জানালার ধারে সে কী করে?'

শিক্ষিকা দুই হাত উপরে তুলে হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'সে
জানালায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনের বাজনদার চিনদোনইয়াদের ডেকে
গানবাজনা করতে বলে!'

শিক্ষিকার বয়ানের সারাংশ দাঁড়ালো এমন—প্রথম ঘণ্টায়
তোত্তোচান ডেস্ক দিয়ে অনবরত শব্দ করে। তারপর সে ডেস্ক ছেড়ে
জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শিক্ষিকা মনে করেন চুপচাপ
দাঁড়ালে সমস্যার কিছু নেই। কিন্তু তোত্তোচান উচ্চকণ্ঠে চ্যাচাতে থাকে
'চিনদোনইয়াসান! এদিকে! এদিকে!' তোত্তোচানের সৌভাগ্য আর
শিক্ষিকার দুর্ভাগ্য যে এই ক্লাশরুমটি নিচতলায় আর এর জানালার
বাইরেই রাস্তা। ক্লাশরুম আর রাস্তার মাঝে নিচু ঝোপালো গাছের বেড়া
ছাড়া কিছু নেই। তাই তোত্তোচান রাস্তার লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে
পারত অনায়াসে। ইশকুলের পাশের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গাইয়ে
বাজিয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন করা চিনদোনইয়ারা শব্দ করে না। কিন্তু
তোত্তোচান তাদের ডেকে ক্লাশের সবার দিকে ফিরে বলে, 'এসেছে!
এসেছে!' আর তখন বাচ্চারা সবাই জানালায় গিয়ে ভীড় করে।

এত বাচ্চার অনুরোধে চিনদোনইয়া দলটি ঘণ্টা-ঢাক-বেহালা
বাজিয়ে চমৎকার গান গাইতে থাকে। গানবাজনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
শিক্ষিকা ক্লাশের ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি
নিজেকে বোঝান যে ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই!

একটা গান বাজানো শেষ হলে বাজিয়ে চিনদোনইয়া দলটি চলে
যায়। বাচ্চারা যে যার ডেস্কে ফিরে আসে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে
তোত্তোচান তখনও জানালার কাছ থেকে সরে না! শিক্ষিকা তাকে
ডেস্কে বসতে বললে সে উত্তর দেয় যে অন্য একটা চিনদোনইয়া দল
যদি আসে! তাদেরকেও দেখতে হবে তো!

'সারাদিন এমনধারা চলতে থাকলে ক্লাশ নিতে পারি না একদম!
মন খারাপ করে শিক্ষিকা বললেন।

এরপর আবারও ডেস্ক খুলে পেনসিল বের করে। আবার ধপাস শব্দে ঢাকনা বন্ধ করে। তারপর আবার মোছার জন্য রবার বের করে। ফের ধপাস শব্দে ঢাকনা ফেলে দেয়। ‘অ’ লেখা শেষ হয়ে গেলেই সে তার সব জিনিসপত্র ডেস্কে ঢুকিয়ে ফেলে। আমি যখন ‘আ’ লিখতে বলি তখন সে ফের একটা একটা করে সব বের করে আর সশব্দে ঢাকনা ফেলে দেয়। এরপরে ফের সব ঢুকিয়ে ফেলে। আবার ‘ই’ লেখার সময় সে একইভাবে এসবের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তার এতবার ডেস্ক খোলা আর বন্ধ করা দেখতে দেখতে আমার মাথা ঘুরতে থাকে। কিন্তু অক্ষর লিখতে হলে ওসব বের করা দরকার। তাই আমি ওকে কিছু বলতেও পারি না!

এসব বলার সময় যেন শিক্ষিকা সেসব ফের দেখতে পেয়ে শিউরে ওঠেন। তার আঁখিপল্লব আরও বেশি পিটপিট করতে থাকে!

মা যেন একটু একটু বুঝতে পারলেন কেন তোত্তোচান ডেস্কের ঢাকনা খোলে আর বন্ধ করে! প্রথমদিন ইশকুল থেকে ফিরেই সে খুশি খুশি গলায় বলেছিল যে ইশকুল তার চমৎকার লেগেছে। ডেস্কগুলো বাড়ির ডেস্কের মতন নয়! চমৎকার বাক্সের মতন করে খোলা যায়।

মা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে ডেস্কের নতুনত্বে মজা পেয়ে তোত্তোচান ডেস্ক খুলছে আর বন্ধ করছে বারবার। অভ্যস্ত হয়ে গেলেই আর সে অমন করবে না। তাই তিনি শিক্ষিকাকে বললেন, ‘ঠিক আছে! আমি ওকে এই ব্যাপারে না হয় ভালোমতন বুঝিয়ে বলব।’

কিন্তু শিক্ষিকা চোখ বড় বড় করে বলে উঠলেন, ‘না...না...শুধু এইটুকু হলে আমি নিজেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিতাম ওকে!’

মা একেবারে মিইয়ে গেলেন একথা শুনে।

শিক্ষিকা যেন ভূতের গল্প বলছেন এমন ফিসফিসে গলায় বললেন, ‘পড়াতে পড়াতে যখন খেয়াল করি যে সে ডেস্ক দিয়ে কোনো শব্দ করছে না তখন দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাশের পুরোটা সময়ই সে দাঁড়িয়ে থাকে।’

মা বিস্ময়ে হতবাক! তবুও কোনোমতে গলায় আওয়াজ ফুটিয়ে বলেন ‘দাঁড়িয়ে থাকে? কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে?’